শিক্ষায় নারীর জন্য কোটা ও প্রণোদনা

গৌতম রায়

১.

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর আলাদাভাবে আরোপিত করার বিষয় নয়; বরং শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ-জাতি-অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে কল্যাণরাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত সবাইকে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও যোগ্যতাভেদে সমভাবে উপস্থাপন করা। দুঃখের বিষয়, সে ধরনের কর্মপন্থা অনেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন মাত্রায় অনুপস্থিত। বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের সমতা, প্রায় সব ক্ষেত্রেই, এখনো একটি দূরের স্বপ্ন। বলা হয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার ফারাক একেবারে ঘুচিয়ে আনা অসম্ভব; কিন্তু রাষ্ট্র চেষ্টা করলে বৈষম্যের পরিমাণটুকু উনিশ-বিশে নামিয়ে আনা অবশ্যই সম্ভব। যেসব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষের আপাত সমতা রয়েছে বলে দাবি করা হয়, সেখানেও এই বৈষম্য দূর করা যায় নি, কিন্তু তারা দৃশ্যমান অনেক পার্থক্য দূর করতে পেরেছে। কল্যাণরাষ্ট্রের গুণাবলি বাংলাদেশে অনুপস্থিত; তাছাড়া এটি পূর্ণাঙ্গ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নয়, বরং একে মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামোয় দ্রুত বিকাশমান একটি রাষ্ট্র বলা যায়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সেবাকে যেমন পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তেমনি এই অর্থনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী কিংবা অপরাপর অ-মূলধারার বিষয়গুলোকেও পণ্য হিসেবেই চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা যায়। এ ধরনের উন্মুক্ত অর্থনীতিতে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন পড়ে। পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে নানা বিষয়ে বাহ্যিক উদার মানসিকতা স্থাপনের সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। ফলে উপর্যুক্ত দুটো কারণে নারীকে ঘরের বাইরে বেরোতে ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের পক্ষ থেকে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার উৎসাহ ও নিগ্রহের শিকার হতে হয়, একাধারে। দুটোর মধ্যে কোনটির প্রাবল্য বেশি বা কম– তা অন্য আলোচনার বিষয়। এটুকু বলা যেতে পারে, নারীর ঘর থেকে বাইরে আসার প্রক্রিয়াটি উন্মুক্ত হলেই তাদের পথচলা মসৃণ হয় না; বরং অমসৃণ পথগুলো নানা জায়গায় থরে থরে চোখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়ে।

রাষ্ট্র এক ধরনের অধরা-বিমূর্ত সংগঠন। অসংখ্য মানুষ এবং সংগঠনের বাস্তব ও অবাস্তব সমষ্টির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য রূপরেখা হলো রাষ্ট্র। সমাজও সেরকমই। বরং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের সংজ্ঞা জটিলতর। কিন্তু এই দুটোর তুলনায় পরিবার নামক সংগঠনটি অনেক বেশি দৃশ্যমান ও বাস্তব–

প্রতিটি মানুষের জন্য। প্রতিটি পরিবারে যে মানুষগুলো থাকে– ধনী কিংবা গরিব, নারী কিংবা পুরুষ– তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে একাধারে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়; যদিও সেগুলোতে পরিবারের মতো আপাতদৃঢ় বন্ধনের সিস্টেম বিরাজমান নয়। পরিবারে গড়ে ওঠা আচরণিক বৈশিষ্ট্য, যা একইসঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত, তা সমাজ ও রাষ্ট্রে একইভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং নারী-পুরুষ কিংবা অন্য যেকোনো ধরনের বৈষম্য এক জায়গায় চর্চা হলে সবগুলো ক্ষেত্রে সেই চর্চার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে আশার কথা যে, এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। রাষ্ট্র নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে বৈষম্য কমানোর জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এর প্রভাব পরিবারে পড়ছে সরাসরি, প্রভাবিত হচ্ছে সমাজও। ব্যক্তিমানুষ এখন যোগাযোগের দিক দিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত। তারা জানছে অন্য সমাজের আচরণ, বৈশিষ্ট্য ও চর্চার মৌলিক বিষয়সমূহ, যেগুলোর সঙ্গে ব্যক্তির শুধু নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও উন্নয়নসূচক সরাসরিভাবে নিহিত। ফলে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু 'উদারনৈতিক' চর্চা দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যেও। যেহেতু মানুষের সচেনতনতা ও তা চর্চার গতির বিষয়টি সমাজভেদে আপেক্ষিক; সুতরাং কত সময় পর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে, অন্তত, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর হবে কিংবা সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসবে, তা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এসব বিষয়ে তথ্যের অভাবও রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত গবেষণামূলক সুপারিশ। থাকলে সরকার নারী-পুরুষ সমতা রক্ষণের বিষয়ে যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে, সেগুলো কতটা যথেষ্ট কিংবা আদৌ যথেষ্ট কি না তা বলা যেত!

সরকার এবং রাষ্ট্র যদি নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে চায় কিংবা তাদের একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রবেশগম্যতার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে চায়, তাহলে তা করতে হয় বিশেষ কোনো উদ্যোগকে কেন্দ্র করে কিংবা রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনে আবশ্যিক কিছু স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ ধরনের বিষয় হচ্ছে কোটা ও প্রণোদনা। একটি সর্বনিম্ন যোগ্যতাকে ভিত্তি ধরে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা বা চাকুরিতে অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করাই কোটা ও প্রণোদনার মূল কাজ। এতে যারা কোটা পাচ্ছে, সেই জনগোষ্ঠীর অন্যরাও উৎসাহিত হয়। নিজেদের বিকশিত করার প্ল্যাটফর্মও তারা পায়; কোটা না থাকলে যে জনগোষ্ঠীর অনেকে হয়ত প্রতিযোগিতার আওতায়ই আসত না। কিন্তু সামান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটু বেশি সুযোগ দিলে তা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র যে পরিমাণে উপকৃত হয়, সেটি হিসেব করার দৃশ্যমান প্রক্রিয়া বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকলেও অদৃশ্যমান ও দীর্ঘমেয়াদি উপকারগুলো সবাই অনুধাবন করতে পারেন। যদিও যে জনগোষ্ঠীকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়, তাদের অনেকেই এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে চান না। বিষয়টিকে বাড়তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'অন্যায়' সুযোগ হিসেবে দেখার প্রয়াসও দেখা যায় তাদের অনেকের মধ্যে। বাড়তি সুযোগ মানে প্রতিযোগিতার মান হ্রাস– এ ধরনের বক্তব্যও পাওয়া যায় প্রচুর। উভয় পক্ষেই প্রচুর যুক্তি রয়েছে; কিন্তু বাস্তবতা বিচারে দেখা যায়, যে জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই পিছিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনামূলক সুবিধা সৃষ্টি না করলে মূলগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারাটা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের যেহেতু একটি অন্যতম কাজ, তা লোকদেখানো হলেও, সমতাবিধানের পথ প্রশস্ত করা; সুতরাং রাষ্ট্র এ ধরনের কোটাভিত্তিক সুবিধা বাড়াতে চায় কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রাখতে চায়। মানব উন্নয়ন

সূচকে যেসব বিষয় থাকে, তার অনেকগুলো এ ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার সঙ্গে সম্পৃক্ত– প্রতিটি রাষ্ট্রই সেখানে নিজের অবস্থানের উত্তরণ ঘটাতে চায়। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও চুক্তি মেনে চলা বা সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো রাষ্ট্রের একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। প্রতিটি রাষ্ট্র সেখানে অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের কৃতিত্ব বজায় রাখার জন্য হলেও কিছু কাজ করতে চায়। সব মিলিয়ে এ বিষয়গুলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কিছু বাড়তি সুবিধা দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে– রাষ্ট্রের কিছু উদ্যোগ সেখানে সমতাবিধানে সহায়তা করতে পারে।

নারীদের জন্য কোটা বরাদ্দ ও প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি যদিও নানাভাবে আলোচনা করা যায়, তবে যে ক্ষেত্রটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম, সেই ক্ষেত্র অর্থাৎ শিক্ষায় নারী কোটা ও তাদের প্রতি প্রণোদনার বিষয়টি এই লেখায় মুখ্য। উল্লেখ্য, এখানে কোটা ও প্রণোদনা বলতে শুধু একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা অনুপাতকে বোঝাচ্ছে না; বরং কোটা ও বিশেষ প্রণোদনাকে একত্র করে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যৌথকর্মপন্থাকে চিহ্নিত করবে। বিশেষ প্রণোদনাও একপ্রকার পরোক্ষ কোটা– রাষ্ট্রের বা সমাজের পক্ষ থেকে যেহেতু প্রতিটি মানুষকে সমভাবে ধারণ করার কথা– কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সমতাবিধানের কারণে সরাসরি কোটা পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম-অবস্থান সৃষ্টি করা যায় না। তাছাড়া, সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র– দুটো আলাদা বিষয় এবং পদ্ধতিগত কারণেই কোথাও কোথাও কোটা ও কোথাও কোথাও বিশেষ প্রণোদনা বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.

শিশু জন্মের সময় পুরুষ কিংবা নারী যে লৈঙ্গিক পরিচয়টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেটি তার উপযুক্ত বিকাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাহত হওয়ার কথা নয়– কিন্তু, বাস্তবতা বলছে, প্রায়শই তা হচ্ছে। শিশু শব্দটি একাধারে উভয় ধরনের মানুষের সত্তা বহন করে, কিন্তু মেয়েশিশু কিংবা ছেলেশিশু শব্দবন্ধের মাধ্যমে পরিচিতি আলাদা করার প্রক্রিয়াগুলো সমাজের শুরু থেকেই বিদ্যমান– ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর জন্মের আগে থেকেই। ফলে শিশু হয়েও মেয়েশিশু আখ্যা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য কিছু নিষেধাজ্ঞা কিংবা সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয় ওই শিশুদের সামনে, যেখানে শিক্ষাজীবনের শুরু কিংবা আরো আগে থেকেই তাদের পোহাতে হয় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা। আইনের ভাষা মান্য করলে, প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সমাজ সেখানে আইনিভাবে বাধ্য নয়, কিন্তু সব শিশুকে সমভাবে বিকশিত করার প্রাথমিক দায়িত্বটুকু সমাজের কাঁধেই আসে। কিন্তু সেখানে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে, তা যতটুকু আলোচনার বিষয়; সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলোকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিমণ্ডলে মেয়েশিশুর বঞ্চনাকে রোধ করার জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলোও সেরকমই আলোচনার দাবিদার। সেখান থেকে শিক্ষায় নারীদের জন্য কোটা বা প্রণোদনা হিসেবে কী গ্রহণ করা হচ্ছে, তা উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা ভালো, দার্শনিকরা যুগে যুগে শিক্ষার জন্য যে ধরনের মত এবং সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সেখানে তাঁরা ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে

শিক্ষাকে চিহ্নিত করেন নি, বরং সামগ্রিকভাবে শিশুর শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনাগুলো তাঁদের বক্তব্যে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর পশ্চাদগামিতার বিষয়গুলো লক্ষ করে আন্তর্জাতিক আলোচনাগুলোতে মেয়েশিশুর বিষয়গুলো আলাদাভাবে উঠে এসেছে।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকার (Education is the fundamental human right as set forth in UN Declaration of Human Rights, 1948) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে [১]। পাশাপাশি ঘোষণাপত্রে ছেলে কিংবা মেয়েশিশুকে আলাদাভাবে গুরুত্বারোপ না করে একত্রে সকল মানুষের জন্য ২৬ নম্বর ধারায় যে ভাষ্য রয়েছে, তা এরকম :

- প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা সাধারণভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে এবং উচ্চশিক্ষায় মেধানুযায়ী সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে।

- প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ধারণা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সব জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে এবং শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা তুলে ধরবে।

অর্থাৎ এ ঘোষণায় নারী ও পুরুষকে আলাদাভাবে বিচার না করে একত্রে মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানবিক সত্তার শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাপ্রদানের কিংবা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টিতে ছেলেশিশু ও মেয়েশিশু সমান অধিকারের দাবিদার। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশুদের অধিকার সংবলিত কনভেশনের (Convention on the Rights of the Child, 1989) ২৮ ধারায় শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে [২] :

- সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে এবং এই অধিকার শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে অর্জনের জন্য রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে :

    ১. প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এই শিক্ষা বিনাবেতনে সবার আওতার মধ্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করবে;

    ২. বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করবে, সাধারণ ও বৃত্তিমুখী শিক্ষাসহ এবং এসব কার্যক্রম প্রত্যেক বালক-বালিকার নাগালের মধ্যে পাওয়ার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার, বিনাবেতনে শিক্ষালাভের এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করবে...

- রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে শিশুর মানব মর্যাদা সংরক্ষণ ও বর্তমান কনভেনশনের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হয়।

ওই একই ঘোষণার ২৯ নম্বর ধারায় বলা রয়েছে :

- রাষ্ট্রসমূহ ঐকমত্যে পৌঁছাবে যে শিশুদের শিক্ষা পরিচালিত হবে :

    ১. শিশুর ব্যক্তিত্ব, গুণাবলি, মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বাধিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে;

    ২. শিশুদের মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও জাতিসংঘের সনদে অন্তর্ভুক্ত নীতিমালাসমূহের প্রতি মনোযোগী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার লক্ষ্যে;

    ৩. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শিশুদের মমত্ববোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

লক্ষণীয়, প্রথম ঘোষণার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পর ১৯৮৯ সালের কনভেনশনেও 'শিশু'দের একটি সত্তা হিসেবেই প্রধানত চিহ্নিত করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে প্রথমবারের মতো বালক-বালিকাকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে ('...প্রত্যেক বালক-বালিকার নাগালের মধ্যে')। তার মানে, বাস্তবতার নিরিখে বালক ও বালিকাদের যে আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো সেটিকে স্বীকৃতি দিলো। সাধারণভাবে বিশ্বের প্রতিটি দেশেই যেভাবে বালকদের শিক্ষাসহ অন্যান্য অধিকার রক্ষিত হচ্ছিল বা হচ্ছে, তার তুলনায় বালিকাদের অধিকার খর্ব হচ্ছিল ও হচ্ছে এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মকভাবে। আন্তর্জাতিক ঘোষণায় কোনো নির্দিষ্ট প্রান্তিক গোষ্ঠীর আলাদা করে নাম উল্লেখ করা গুরুত্ব বহন করে। সে অর্থে, বালক ও বালিকাদের নাম আলাদাভাবে ঘোষণার এই তাৎপর্যটুকু উল্লেখযোগ্য।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের (World Conference on Education for All - WCEFA) ঘোষণায় (World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs) সবার জন্য শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হলেও সেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও পূর্বের ঘোষণাগুলোর তুলনায় সর্বাধিক জোর দিয়ে মেয়েশিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঘোষণায় পরিষ্কারভাবেই বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের প্রবেশাধিকার সর্বজনীন করা এবং সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, নারীদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা; শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী বা মেয়েদের সব বাধাবিপত্তি দূর করা এবং শিক্ষায় জেন্ডার ব্যবধান কমানোর কথা বলা হয়। বিশেষত, এরই সূত্র ধরে, মেয়েশিশুরা যেন সহজে বিদ্যালয়ে যেতে পারে সেজন্য কমিউনিটির কাছাকাছি কিংবা, প্রয়োজনবোধে, কমিউনিটির ভেতর একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়; অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষার ব্যয়ভার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; যাতে অভিভাবকগণ শুধু তাদের ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হন। পাশাপাশি এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন ও অ্যাডভোকেসির ব্যবস্থা করা হয় এবং বিদ্যালয় যাতে মেয়েশিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনভাবে এর কাঠামো বিন্যাসের চেষ্টা করা হয়। এ সবই যে বাংলাদেশে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে তা নয়; কিন্তু এ ঘোষণার অনুসারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এগুলো বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম

(World Education Forum) ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য সুস্পষ্টভাবে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেখানে শুধু শিশু বা মানুষ হিসেবে নয়, আলাদাভাবে মেয়ে ও নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয় [৩] :

১. শিশুর যত্ন, বিকাশ ও পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শিক্ষা, বিশেষ করে বিপন্ন ও অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে রত হওয়া;

২. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সব ছেলেমেয়ের জন্য, বিশেষত মেয়েদের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে, বিনাবেতনের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; এই শিক্ষায় চরম প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে এমন ছেলেমেয়ে এবং সংখ্যালঘুদের ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

৩. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতা বর্তমান পর্যায় থেকে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, আরো ৫০ শতাংশ অগ্রগতি সাধন করা, এটাও নিশ্চিত করা যাতে মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় বয়স্ক লোকদের সবার প্রবেশের সম-সুযোগ থাকে;

৪. আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে জেন্ডারবৈষম্য নির্মূল করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকতে হবে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষায় মেয়েদের পূর্ণ ও সমান প্রবেশাধিকার এবং শিক্ষার্জন।

দেখা যাচ্ছে, ডাকার সম্মেলনের ছয়টি ঘোষণার মধ্যে তিনটিতেই আলাদাভাবে মেয়ে ও নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে মেয়ে বা নারীদের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে আলাদা উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতিও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। ২০০০ সালে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goal) নামে যে কয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে গুরুত্বপূর্ণভাবেই নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে [৪] :

২ নম্বর লক্ষ্য : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

টার্গেট ৩ : ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বত্র বালক-বালিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করা

৩ নম্বর লক্ষ্য : জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

টার্গেট ৪ : ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষায় জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ

এগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বা সিডও (CEDAW) প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্যের বিষয়গুলো তুলে ধরে সেগুলো সমাধানের ওপর নির্দেশনা প্রদান করেছে [৫]। এবার দেখা যাক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও আইনি বিধান নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়কে কীভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আছে [৬] :

ধারা ১৯ (৩) : জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

ধারা ২৭ : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধারা ২৮ (২) : রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

২৮ (৪) : নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯ (১) : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২৯ (২) : কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

এছাড়া, সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে :

১৭। রাষ্ট্র

১. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

২. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

৩. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণার পাশাপাশি দেশের সংবিধান ও আইনি কাঠামোতেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার নানা সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে, যার ফলে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মেয়েশিশুদের ভর্তির হার এখন প্রায় শতভাগ; যদিও তাদের একটি বিরাট অংশ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই ঝরে পড়ছে। তবু, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এই চর্চাটুকু সার্বিকভাবে ইতিবাচক। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার কারণে সেখানে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার যতটুকু, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি অনেক পরিমাণ বেশি। মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা কিছুটা হলেও এই ঝরে পড়ার রাশটুকু টেনে ধরেছে; না হলে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে নারীদের আরো বেশি ঝরে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতো।

চাকুরিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি দিন দিন দেখা যাচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক হিসেবে নারী-পুরুষের অনুপাত হবে ৬০:৪০। এই সিদ্ধান্তের ফলে এই স্তরে নারী শিক্ষকের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি এই স্তরে শিক্ষক হওয়ার জন্য নারীদের যোগ্যতা কম রাখা হয়েছিল, সম্প্রতি তা বাড়ানো হয়েছে (কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নারীদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক)। উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে।

৩.

নারী শিক্ষায় কোটা ও প্রণোদনার বিষয়টি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অনেকটাই ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে– যদিও সেই পরিবর্তনটুকু আরো দ্রুততার সাথে ও বেশিমাত্রায় হতে পারত। শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা; মাদ্রাসা থেকে শুরু করে কারিগরি শিক্ষা; সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমতা যেন থাকে, সে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোটা ও প্রণোদনা যেহেতু উদ্দীপকের কাজ করে, সুতরাং তা মানুষের চিন্তাভাবনার জগতেও বড়ো পরিবর্তন এনে দেয়। বয়সকালে ছেলেসন্তানের প্রতি মা-বাবার মুখাপেক্ষিতার বিষয়টি মুখ্য হওয়ার কারণে লেখাপড়ায় ছেলেসন্তানের নানা চাহিদা যেমন গুরুত্ব পায়, মেয়েসন্তানের শিক্ষা তেমন গুরুত্ব পায় না– এই বাস্তবতা এখনো বহুলাংশে বিদ্যমান। সমাজের এই ট্যাবুকে ভাঙতে হলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, এক গোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোটা বা প্রণোদনা সৃষ্টির অর্থ অপর গোষ্ঠীকে প্রবেশগম্যতা বা অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত করা নয়। বরং রাষ্ট্র সব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বজায় রেখেই পিছিয়ে পড়াদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম। শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য ঘুচানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঘোষণার প্রতিশ্রুতি মোকাবিলা করতে এই কোটা ও প্রণোদনার বিকল্প সম্ভবত নেই। তবে কোটা ও প্রণোদনার বিষয়গুলো যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, সেটি একটি বাড়তি পর্যবেক্ষণের বিষয়।

গৌতম রায় প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। goutamroy@ru.ac.bd

তথ্যসূত্র

[১] United Nations (1998). Fiftieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. United Nations: Department of Public Information. (This was prepared to publish in the Internet by the information technology section of UN)

[২] United Nations (1989). United Nations General Assembly: Convention on the Rights of the Child. United Nations: Department of Public Information.

[৩] UNESCO (2000). The Dakar Framework for Action for All, adopted by the World Education Forum, para 7. UNESCO.

[৪] http://www.un.org/millenniumgoals/

[৫] www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

[৬] http://www.pmo.gov.bd/pmolib/constitution_bangla/Index.html